আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও

অঞ্জন চক্রবর্তী

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এলে কোন জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ-ব্যাকুলতা
সে যে অনেক দিনের কথা

(কিশোর প্রেম' পূরবী)
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

'ছেলেবেলা' লিখতে লিখতে যে নারীর অনুষঙ্গ সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে, সবচেয়ে গুরুত্ব পায় এবং যার কাছে গুরুত্ব না পাওয়া সবচেয়ে প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তিনি কাদম্বরী। বাড়ীতে তাঁর আবির্ভাব যেন কিশোর রবির সামনে খুলে দিলো 'charmed magic carement.' :

> এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শ্যামলা হাতে শরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ।''

'পূরবী'র বেশ কিছুদিন পর লেখা 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯)। কবি যেখানে স্মৃতির উজানে ভেসে চলেছেন 'অনেক দিনের কথা'তেই। 'স্কুল পালানে', 'কাঁচা আম' নামকরণগুলি দেখলেই স্পষ্ট হয় এই ঝোঁক। এই আকাশপ্রদীপের 'শ্যামা' কবিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য। তাঁর মতে 'বারো থেকে চোদ্দবৎসরের এই অধ্যায়—এই কিশোর-কিশোরী লীলা 'আকাশ-প্রদীপে'র 'শ্যামা' কবিতায় অনবদ্য কাব্যরূপ পেয়েছে। কবি নতুন বৌঠানের শব্দালেখ্য বৌঠানের কিশোরী রচনা করে বলছেন,

উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হারখানি,
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে

(নির্বাসিত রাজপুত্র : কবিমানসী ১)

'শ্যামা' কবিতায় কিশোর প্রেমিক কাছে পেয়েও তার প্রেমিকাকে পায় না :

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো না হয় যায়
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়

'কিশোর প্রেম' কবিতার প্রেমিকও জানায় এই অপূর্ণতার কথা :

সেই সেদিনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরুহিয়ার না-বলা সেই বাণী—
সেই আধেক জানাজানি।

আমরা এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি একটি গানের দিকে এগোতে চাইছি, যার বাণী আক্ষরিক তল থেকেই ধরে নেবে কবির মর্মের এই বেদনা :

শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে-ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা॥

এই দূরত্ব কোনো বিচ্ছিন্ন উল্লেখ নয়, 'ছেলেবেলা'র এই অংশটিতে ফিরলে মনে হয় কবির এ এক leitmotif :

> মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম; তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন। আত্মীয়রা বললেন—ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

লক্ষণীয়, এর পরে পরেই রবীন্দ্রনাথ যাবেন কাদম্বরীর অনুষঙ্গে (বউঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উল্টো), রবি কোনোদিন বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারবে না—এমনি ছিলো তাঁর খোঁটা বা খোঁটার ছদ্মবেশে উশ্‌কানি। যাইহোক, এই উশ্‌কানি কবিকে নিরন্তর প্রয়াসী করেছে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার, যে রবীন্দ্রনাথ দূরত্বকে মেনে নিয়েও এই দূরত্বের শূন্যস্থান ভরিয়ে দেন তাঁরই সৃষ্টিতে। প্রেরণাদাত্রীকে পাওয়া যায় না, কিন্তু সৃষ্টি হয়ে চলে। দুজনের মাঝখানে থেকে যায় সৃষ্টি :

> দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
> আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥

'চরণ' শব্দটির অর্থ এখানে সম্ভবত ত্রিবিধ। একদিকে সুরগুলি অবয়ব পাচ্ছে চরণে, অন্যদিকে সুরগুলি পাচ্ছে রশ্মি-চরণের আরেক অর্থ। 'ছবি ও গানে'র উৎসর্গে কবি লেখেন 'যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম'। কাদম্বরীর কিরণপাতেই (বা রশ্মিতে) বিকশিত কবির গান। অন্যদিকে 'চরণ' মানে পদ ভাবলে কবির সৃষ্টি কাদম্বরীর পায়ে অর্পিত। এই কিরণে ফুল ফুটে ওঠার ভাবনা আমাদের আরো একটি গানের দিকে নিয়ে যায় :

> মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের কুসুমখানি
> তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি॥

'দাঁড়িয়ে আছো'র শেষে ছিলো বাঁশি নিজেই এসে বাজানোর আমন্ত্রণ। 'মোর প্রভাতের এই' শেষ হচ্ছে কবির বীণা বুকে টেনে নেবার আহ্বান দিয়ে :

> আমার বীণাখানি পড়ছে আজি সবার চোখে,
> হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।
> ওগো কখন সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
> শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে—
> যখন তুমি তারে বুকের 'পরে লবে টানি॥

'তোমার যা তা তুমি এসে নাও, ওগো অন্তরের কবি, তুমি এসে গ্রহণ করো তোমার যা কিছু, একান্তে ডাকো আমাকে'—এই আকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কবির হৃদয়ে বারংবার।

২

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস—
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

আমরা আবার ফিরে এলাম 'কিশোর প্রেম' কবিতায়, কবির আকুল হয়ে ফিরে তাকানোয়। যে মাধুরী কবি ছন্দোবন্ধনে ধরেন সে তো 'সুদূর রাতের পাখি', তার পাখা 'বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে' রঙিন। তাই ফেলে আসা ফাগুন দোলা দেয় কবিকে :

নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল,
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল,
সর্বেক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল।

সেই অসমাপ্ত অপূর্ণ বসন্ত আজো তার প্রবাহ নিয়ে কাজ করে চলেছে গোপনে গোপনে, তার-ছোঁয়ায়, একটুকু ছোঁয়ায় কবির সৃষ্টির প্রবাহ ছুটে চলেছে নিজস্ব ধারায় :

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা—
সেই শেষ-না-করা কথা।

এই শেষ-না করা কথার রেশ ফুরোয় না কখনো, grecian urn-এর মতো সে যেন সতত সঞ্চরমান, আর তার বার্তা নিয়েই চলে সৃষ্টির লীলা :

তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা মর্মে আমার আছে সে বারতা
না বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো॥

'কাছে পেয়ে না পাওয়ার অফুরন্ত পরিচয়' অহরহ জানিয়ে দেয় সুন্দরের দূরত্বের কথা। বারবার মনে করিয়ে সে অনেক দূরে :

ও যে দূরে ও যে বহুদূরে।
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

দূরত্বের সঙ্গে শিরীষের শাখার এই সংলগ্নতা আমাদের আরেক বিরহ-বিধুর গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এও সেই বহুদিনের ফাল্গুনের কথাই :

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি
'এসেছে কি - এসেছে কি'।

সেদিন ভেসেই চলে গেছে, ঝরে পড়েছে 'সেই মুকুল', যে আর আসবে না। তবু এমন করে কি সবাই মনে রেখেছে তাকে যেমন করে কবি রেখেছেন :

কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে।
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাসদোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী বাওয়ায়।

কাদম্বরীর মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'তেই এসে গেছে এই বিস্ময়ের অনুষঙ্গ :

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে
তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে
পারি না কেন? এ সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি।

'সেই সেকালের তরী বাওয়া'র রূপক বারবার এসেছে কবির গানে, 'সোনার তরী'র রহস্যময়ী নাবিক কখনো হয়েছে 'খেয়ার নেয়ে', কখনো আরো বিস্তৃততর হয়েছে তার পরিচয়—আমার সুরের রসিক নেয়ে :

আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাব গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।

এই গান শোনানোর ইচ্ছে, গান শুনিয়ে ভোলানোর ইচ্ছের সূত্র রয়ে গেছে সেই 'ছেলেবেলা'তেই :

বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাৎলা চাদর

উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা কখনো তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

এই গান শোনানোর আরো একটি অমল অনুষঙ্গে আমরা যাবো যার চিরস্থায়ী প্রভাব রয়ে গেলো গীতিকার রবীন্দ্রনাথের মানসজগতে :

গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে। মনে পড়ে—থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বউঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেননি, চুপ করে শুনলেন।

কবির কাছে এই হিরন্ময় নীরবতা অনেক তারিফের বাড়া। কবির বর্ষাগানের সম্ভার কেন এত বহুদূরগামী, কেন আটাত্তর বছর বয়সেও তিনি লিখে চলেন 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদলদিনে' বা 'আজি তোমায় আবার চাই শোনাবারে', কেন তার প্রকৃতি পর্যায়ে চিহ্নিত বর্ষার গান আদপে বারবার প্রেমের গানই হয়ে ওঠে তা বুঝতে বাকি থাকে না আমাদের। 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ', 'আজি বরিষণমুখরিত শ্রাবণরাতি', 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম', 'আমার প্রিয়ার ছায়া', 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও', 'আমার যেদিন'—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি! Browning-এর ভাষা ধার করে বলতে হয় instant কখনো কখনো eternity নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই ঘটনাই ঘটেছে সেই বাদলদিনকে ঘিরে।

বাদলদিনকে যিনি 'সুর দিয়ে মিনে করা' ভাবতে পারেন, লিখতে পারেন 'বর্ষাগানের সিন্দুক' তাঁর কাছে গান তো ধন-সম্পদ-ই। ২৫.৬.১৯১২তে 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' লেখার পর দীর্ঘদিন কোনো গান লেখেননি রবীন্দ্রনাথ। ভেসে উঠলেন ফের ২৪.৮.১৯১৩তে। এই সময়টুকু খুব সহজে কেটেছে এমন নয়। সুর ভুলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে 'কেবল কাজে', দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে বিশ্বভারতীর ঝুলি ভারতে, কারো 'চোখের ভৎর্সনা' তো কাজ করবেই। দীর্ঘদিনের নীরবতার পর ফুটে উঠেছে যাঁর কাছ থেকে পাওয়া তাঁকে কিছু দেবার তৃপ্তি। 'অন্তরের কবি'ই তো লেখান কবিকে, তবু তাঁরই সৃষ্টি তাঁকে শুনিয়েই কবির মৌনতাভঙ্গের সার্থকতা, কারণ এ তাগিদ সঞ্চারিত করেছেন অন্তরের কবিই, তিনি ডাকলে কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর :

অসীম ধনতো আছে তোমার, তাহে সাধনা মেটে।
নিতে চাও তো আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে॥
দিয়ে রতন মণি, দিয়ে তোমার রতন মণি আমায় করলে ধনী
এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে।

'দিয়ে রতন মণি' লেখার পর আবার 'দিয়ে তোমার রতন মণি' লেখায় কবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে যেন তুলতে চান তাঁর ঋণ। আবার কার তাড়নায় 'দ্বার এঁটে' গান বন্ধ রাখার পর খুলে যায় দরজা সেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি ও প্রেরণাদাত্রীর এ এক আশ্চর্য লীলা।

৩

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।
তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে,
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

কিশোর প্রেমে শারীরিকতার কোনো জায়গা ছিলো না এমনটি ভাবা ঘোর অবাস্তব। এই কবিতাতেই পরম তৃপ্তির মতো এসেছে 'হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা'র অনুষঙ্গ, অধর পারে আসা 'কম্পিত চুম্বন' উড়তে না পারলেও এসেছিলো তো! 'শ্যামা' কবিতাতেও এসে যায় হাত ধরার অনুষঙ্গ :

একদিন বলেছিল, 'জানি হাত দেখা'।
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
বলেছিল, 'তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন'। দিই নাই কোনই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিত দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

এই কবিতাতেই অবশ্য উল্লেখিত হয়েছে এই শারীরিকতার সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ :

দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া
সূক্ষ্ম স্পর্শময়ী।

এই সূক্ষ্ম স্পর্শময়তা বারবার দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান :

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে বিসের হর্ষ,
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলোকেশের স্পর্শ।

কিংবা

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।

এই স্পর্শসুখ আরো শৈল্পিক হয়ে ওঠে যখন কবি তাঁর নিজের সৃষ্টিকেই নিয়ে আসেন শারীরিক ব্যঞ্জনায় :

তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজনজীবনবিহারী॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম জীবনমরণবিহারী॥

'বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে' যে নবকৈশোরের মেয়ে তাকিয়ে ছিলো, তার কথাই 'শ্যামল ঘন নীল গগনে' দেখে মনে পড়ে কবির, মনে পড়ে 'সেই সজল কাজল আঁখি'। সেই চোখেই কবি মোহের স্বপন অঞ্জন আঁকতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। সঙ্গীত কবির অস্তিত্বের পরম অংশ, তাকে প্রসারিত করেই তাঁর সুন্দরের সঙ্গলাভ, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন।

এই শারীরিকতার মাধুর্য যেন সবচেয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি পায় কাদম্বরীর বাচনিকে চিরভক্ত কবির প্রতি উচ্চারণে :

মোর নয়নের বিজুলি-উজ্জ্বল আলো
যেন-ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো একি সত্য।
মোর-মধুর অধর বধূর নবীন অনুরাগ সম রক্ত
যে আমার চিরভক্ত, একি সত্য।
অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে
মোর চরণে চরণে সুধাসঙ্গীত বাজে একি সত্য।

'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কামনার চোখে সুন্দরকে দেখার অনুতাপ ও আত্মশাস্তি-বিধানের কথা লিখেও কাদম্বরীর সৌন্দর্য সম্পর্কে মুগ্ধতাকে মোছার দিকে কবি যাননি। তাকে শিল্পিত সূক্ষতায় তুলতে চেয়েছেন। রূপকে এড়িয়ে অরূপে যাওয়ার সাধনা তাঁর নয়, রপসাগরে ডুব দিয়েই অরূপরতন পেতে চান তিনি।

৪

কাদম্বরী কবিকে ধর্ম দিয়েছেন—সেই ধর্ম যা তাঁর কাব্য ও জীবনকে ধরে রেখেছে। বিচ্যুতি সম্পর্কে দগ্ধ হয়েই তিনি একদিন লিখেছিলেন :

কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে যে হয় সারা।

'জীবনের ধ্রুবতারা' তাঁকে যে জীবন দিয়েছেন তাঁকে বহু যতন করে ধুয়ে মুছে রাখার দায়িত্ব কবির। তিনি 'জীবনদেবতা'র কাছে বিচার প্রার্থী :

দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।

এ ধর্ম শুধু অনুশাসনের নয়, এখানে আছে স্নেহের স্নিগ্ধস্পর্শ, আছে কলুষমোচনকারী মরমী প্রক্রিয়া। এবং এ সমস্তই চলেছে নিত্য সৃষ্টির পথে কবিমানসীর অবিনশ্বর অনুপ্রেরণার সঙ্গে সঙ্গেই, ethics এবং aesthetics এখানে একই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে :

তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি
তুমি যদি দুখ 'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দণ্ড করহ দূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর।

সজীব ভালোবাসার পাত্রী, কাব্যের প্রেরণাদাত্রী, ধর্মস্বরূপিনীর কাছ থেকে কবি পেয়েছেন আরো এক মস্ত আশীর্বাদ। কবি তাকে সামনে রেখেই দীক্ষিত হয়েছেন আত্মসংকোচনে। যে কোনো প্রতিভাবান মানুষেরই অহং একটি বড় সংকট হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আমিত্বকে তো উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় ফুৎকারে, এ যে রীতিমতো কঠিন, কঠোর বাস্তব। এই ফাঁদ থেকে বেরোতে না পারলে সহস্র শৈবালদাম বেঁধে ফেলবে তাঁর গতিপথ। রবীন্দ্রনাথ বড় অনুপম পথেই তাঁর মুক্তি খুঁজেছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিয়ের প্রস্তাব

দিতে গিয়ে বলেছিলো যে সে তেমন কেউ নয়, তাই তাকে বিয়ে করাটাও কোনো ব্যাপার হওয়া উচিত নয়, দামিনীর কাছে :

> দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমনকি আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের এমন নিবৃত্তি জ্যাঠামশায়ের হিতৈষণা বা লীলানন্দ স্বামীর রস ঘটাতে পারেনি, পেরেছিলো ভালোবাসা। কাদম্বরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাছে অহংমোচনের পথ :

> আরো প্রেমে আরো প্রেমে
> মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
> সুধাধারে আপনারে
> তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

এই 'আমি'র আরেক বিলীন হবার আকুলতা ব্যক্ত হয় এই গানটিতে :

> দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে'
> আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'॥

'আমি' এত সহজে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই' বলতে পারতো না যদি না 'প্রেম' বলতো 'যুগে যুগে তোমার লাগে আছি জেগে', যদি না 'মরণ' বলতো 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'। যে কাদম্বরী 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রহস্যময়ী নাবিক তিনি মৃত্যুর রহস্যময়তায় একাকার হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সমীকরণ সহজ, কারণ ভানু লিখতে পারেন 'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যামসমান', ভালোবাসা আর মৃত্যু এখানে সমাপতিত। যিনি কায়াহীনা হয়েও মায়া নন, অদৃশ্য সঞ্চালিকা শক্তি, তাঁকে পাওয়ার সাধনাতেই 'আমি'কে একটু একটু করে ডুবিয়ে দিতে হয়। সেই সাধনারই অংশ নিজেকে তুচ্ছতায় ডুবিয়ে কাদম্বরীকে ক্রমশ সর্বোত্তমা, সর্বময়ী করে তোলা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় তাই আব্রহ্মাভুবন ব্যাপ্ত হতে থাকেন এক মহীয়সী নারী, যাঁর অসীম ধন থাকা সত্ত্বেও কবির হাত থেকে তাঁরই দেওয়া ঐশ্বর্য গ্রহণ করেই তাঁর তৃপ্তি। তাই সাধারণ লোকচক্ষু যেখানে অবহেলিতা, সন্তানহীনা, আত্মঘাতিনী এক নারীকে রবীন্দ্রপ্রেমে ধন্য হতে দেখে সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা হাঁটে ঠিক বিপরীত পথে :

> না দেখিবে তারে, পরশিবে নাগো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো—
> তারায় তারায় রবে তারি বাণী কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।

এই গভীর সাধনার চিত্রে সাধারণের উপলব্ধির 'কবিজীবনীর কৈশোরের

প্রেরণাদাত্রী', তাই রবীন্দ্রকাব্যে হয়ে ওঠেন বিশ্বের প্রতিরূপ—আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। কবি বারবার ঊর্ধ্বগামী হওয়ায় আর্তি ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর গানে, কখনো তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আহ্বান করে কখনো বা তাঁকে অবলম্বন করে :

১

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক প্রাণে।

২

আমি উতল প্রাণে আকাশ-পানে হৃদয়খানি তুলি
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে।

৩

আমারে করো তোমার বীণা
লহো লহো তুলে

সেই 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকেই কবির সাধনা শুরু যখন কাদম্বরী প্রত্যক্ষ ছিলেন। সেই অভিষেকের লগ্ন থেকেই ব্যাপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন তিনি কবির কাব্যজগতে:

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরানু রাজটিকা॥

এই লীলা ছিল সংগোপনের ধন, ছিলো না কোনো চড়া পর্দার অভিব্যক্তি। কিছু তার দেখি না বা, কিছু পাই অনুমানে—এভাবেই চুপিচুপি ছড়িয়ে যায় এক ভালোবাসার রোমাঞ্চ-রেশ :

তার স্বপনে মোর আলোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার প্রথম প্রেমের লিখা॥
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখির কলরবে।

'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধে কবি বলেন, 'প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত থাকি আর সমস্তই হারাইয়া যায়। প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা (কবিমানসী ১)।

কবির সাধনাতেও এই রূপক প্রাসঙ্গিক। কবির সুরগুলি চরণ পায় কারণ কাদম্বরী গানের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই সৃষ্টি যখন বিশ্বকে কাব্যের

মহীয়সী নারীর অনন্ত মহিমার সঙ্গে পরিচিত করাতে পারবে তখনই কবির 'ক্ষণিক মরীচিকা'র মতো বিলীন হওয়ার চরিতার্থতা। সেখানেই তাঁর কাব্য ও জীবন সাধনার মোক্ষলাভ :

যাচি হে তোমায় চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরমকান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয় পদ্মতলে।

এই আড়াল তাঁর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব যিনি কবির 'অন্তরের কবি'। এই আড়াল, এই আবরণের নির্মাণই মিলিয়ে দেয় কবির জীবন ও কাব্যসাধনাকে।